# জেলহত্যার বিচার সময়ের দাবী

**এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন**

প্রতি বছর নভেম্বর আসলেই পিতৃ বিয়োগের বেদনায় মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ি। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার ধারাবাহিকতা হিসাবে ৪ জাতীয় নেতা শ্রদ্ধেয় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজ উদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এ এইচ এম কামরুজ্জামানের হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত বিচারের রায় গত বছরের ২৮ আগস্ট শুনে আমরা শুধু হতাশা ও বিস্ময় প্রকাশ করেছি। হাইকোর্টের বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী এবং বিচারপতি আতাউর রহমান খানের ডিভিশন বেঞ্চ নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামীকে বেকসুর খালাস দেন। আর নিম্ন আদালতে যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত চার আসামীকেও খালাস দেন হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামী হলেন দফাদার মারফত আলী এবং দফাদার হাশেম মৃধা (পলাতক)। নিম্ন আদালতে যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন- লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, মেজর (অব.) বজলুল হুদা, একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার)। তাদেরকেও খালাস দেন হাইকোর্ট। অন্যদিকে একজনের (রিসালদার মোসলেম উদ্দিন) মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। যাকে মামলার নথিতে পলাতক হিসাবে দেখানো হলেও তিনি মারা গিয়েছেন বলে জানা যায়। তবে তার মৃত্যু সংক্রান্ত কোন নথি না থাকায় আদালত তাকে পলাতক গণ্য করে তার সম্পর্কে এ আদেশ দেন। রায়ের প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ কৌঁসুলি এডভোকেট আনিসুল হক বলেছিলেন- এ রায় আইনের শাসনের নামে প্রহসন।

আমার খুব মনে আছে- ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের রায়টি শুনে নিহত চার নেতার পরিবার থেকে বিবিসির সাথে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জানানো হয়, আমরা বিচারপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমদের মেয়ে সিমিন হোসেন রিমি বিবিসিকে জানান, যারা বাংলাদেশের রূপকার তাদের হত্যাকাণ্ডের বিচার নিয়ে যদি এ অবস্থা হয়, তবে বাংলাদেশের জনগণ, আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা কতটা অরক্ষিত, এটাই বার বার মনে হচ্ছে। আমিও সেদিন মামলাটিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পরিণতি হিসাবে দেখেছি। আমি ও আমার পরিবার সেদিন মর্মাহত ও স্তম্ভিত হয়ে মিডিয়াকে জানিয়েছিলাম, নিম্ন আদালতের রায়কেই আমরা মেনে নিতে পারিনি। কারণ সেখানে লঘুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। তারা কিভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড থেকে বেকসুর খালাস পায়(!) আমার এটা বোধগম্য হচ্ছিল না। আসলে আমরা অনুভব করছি, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জেলহত্যা মামলা দুটি শুরু ও নিষ্পত্তি করে নেয়া উচিত ছিল। সেই কাজটি বিলম্বিত হওয়ায় পরবর্তী সরকার এই সুযোগগুলো নিয়েছে এবং বিচারের গতিকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার সুযোগ পেয়েছে। আদালতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলব, জেল হত্যার মাধ্যমে যারা জাতির মুখে চুনকালি দিয়েছে, আমাদের বুকে ব্যথার পাহাড় তৈরী করেছে, চোখের সামনে সেই খুনীদের নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যাপারটি আমরা মেনে নিতে পারছিলাম না।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও তৎকালীন দলীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. জিল্লুর রহমান রায় শুনে সেদিন মিডিয়াতে প্রকাশ করেছিলেন, জেল হত্যা মামলায় হাইকোর্টের রায়ে আমি মর্মাহত হয়েছি। আওয়ামী লীগ আশাহত হয়েছে। এ রায়ের ফলে সন্ত্রাসী হত্যাকারীরা পার পেয়ে যাবে। সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড আরো বেড়ে যাবে। সেদিন আমি লক্ষ্য করেছি- আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের মধ্যে একটা বিরাট হতাশার ছায়া নেমে এসেছিল। দেশটাকে যারা স্বাধীন করলেন, স্বাধীন বাংলাদেশেই প্রচলিত সকল আইন-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কুচক্রী মহল জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করে পৃথিবীর ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। এই পাষণ্ডতা, বর্বরতা ও জঘন্য অপকর্মের সঠিক বিচার কি সত্যিই হবে না?

একজন আইনজীবী হিসাবে আমি প্রিয় পাঠকদের জন্য ঘটনার পরবর্তী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থাপন করতে চাই। আমার বাবা এএইচএম কামরুজ্জামানসহ জাতীয় চার নেতাকে ৩ নভেম্বর নৃশংসভাবে হত্যার পর ৫ নভেম্বর লালবাগ থানায় তৎকালীন পুলিশের ডিআইজি আব্দুল আউয়াল বাদী হয়ে রিসালদার মোসলেম

উদ্দিনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। তদন্তভার গ্রহণ করেন থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবিএম ফজলুল করিম। সে বছর ২১ নভেম্বর মামলাটি তদন্তের জন্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের হাতে ন্যস্ত হয়। ডিএসপি সাইফুদ্দিন আহম্মদ মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের ৩ বিচারপতি সমন্বয়ে তৎকালীন সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করায় আইও মামলাটির তদন্ত করতে পারেনি। ১৯৯৬ সালের ১৭ আগস্ট সরকার মামলাটি তদন্তের নির্দেশ দেয়। পরদিনই সিনিয়র এএসপি আবদুল কাহার আকন্দ তদন্তের দায়িত্ব নেন। সে বছর ৯ সেপ্টেম্বর লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান, লে. কর্নেল (অব.) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান এবং মেজর (অব.) খায়রুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয় শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, কেএম ওবায়দুর রহমান ও নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে। ৩ নভেম্বর তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৯৮ সালের ১৫ অক্টোবর মামলার চার্জশীট দাখিল করা হয়। এতে রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমানসহ ২৩ জনকে আসামী করা হয়। আসামী আবদুল আজিজ পাশা জিম্বাবুয়েতে মারা যাওয়ায় তাকে রায়ের আগে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ২০০1 সালের ১৪ এপ্রিল মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। মোট ৭৫ জন সাক্ষীর মধ্যে ৬৪ জনের সাক্ষ্য নেয়া হয় মামলায়। ৬ বছর বিচার প্রক্রিয়া শেষে ২০০৪ সালের ২০ অক্টোবর ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. মতিউর রহমান রায় দেন। রায়ে ৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড, ১৫ জনকে যাবজ্জীবন এবং মেজর (অব.) খায়রুজ্জামান, কে এম ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ও তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। এ রায়ের পরপরই দণ্ডপ্রাপ্তরা আপীল করেন, যার রায় গত বছরের ২৮ আগস্ট হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত হয়। গোটা জাতি এ রায়ে স্তম্ভিত ও মর্মাহত। যেহেতু মামলার বাদী রাষ্ট্র, সেহেতু জেলহত্যার মত লোমহর্ষক ও পাশবিক হত্যাকাণ্ডের সঠিক বিচার প্রাপ্তির জন্য রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে। আপীল বিভাগে যেন সাক্ষীর উপস্থিতি, বঙ্গভবন ও কারাগারে রক্ষিত রেজিষ্টারসমূহ উপস্থাপন, টেলিফোন রেকর্ড ও সাক্ষীদের নির্ভয়ে কথা বলার পরিবেশ নিশ্চিত করে মামলার শুনানীর ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু আদালত বার বার মামলাটি যথাযথভাবে তদন্ত হয়নি বলে উল্লেখ করেছেন (২৮ আগস্ট ২০০৮), সেহেতু এই প্রসঙ্গটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। আমরা আশা করব, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ আমাদের ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত করবেন না। আদালতের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে বলব, পিতৃ বিয়োগের কারণে যে আঘাত আমরা পেয়েছি, সে আঘাতের দাগ এখনো কলিজা থেকে শুকায়নি।

চার জাতীয় নেতারই রয়েছে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ইতিহাস। আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতার জীবন ও রাজনীতি নিয়ে কিছু কথা বলে বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের রক্তঋণ কিছুটা হলেও শোধ করার প্রয়াস পাব। বাবা দীর্ঘ ৩৩ বছরের রাজনৈতিক জীবনে কখনোই কোন নির্বাচনে পরাজিত হননি। তিনি সর্বদাই জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেছেন।

এই মহান রাজনীতিবিদ ১৯২৩ সালের ২৬ জুন বৃহত্তর রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার বাগাতিপাড়া থানার মালঞ্চী রেলস্টেশন সংলগ্ন নুরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস রাজশাহী শহরের কাদিরগঞ্জ মহল্লায়। তাঁর দাদা গুলাই এর জমিদার হাজী লাল মোহাম্মদ সরদার (১৮৪৮-১৯৩৬) ব্রিটিশ আমলে একজন রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ও ঘনিষ্ঠজন। তিনি ১৯২৪-২৬ ও ১৯৩০-৩৬ সালে দু'বার অবিভক্ত বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-এর সদস্য (এমএলসি) নির্বাচিত হন। 'ওণফতবটঢণ কটফণর্ভণঢ ুটভ' হিসেবে তাঁর সময়ে সমাজ জীবনে সর্বমহলে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠালগ্নে তাঁর অবদানের কথা সর্বজনবিদিত।

আমার দাদা আব্দুল হামিদ মিয়া (১৮৮৭-১৯৭৬) ছিলেন একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সমাজসেবক। তিনি রাজশাহীতে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য (এম.এল.সি) ছিলেন। ১৯৩৭ সালে রাজশাহীতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩) উপস্থিতিতে রাজশাহী জেলা মুসলিম লীগের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। তিনি ছিলেন উক্ত কমিটির সভাপতি এবং মাদার বখশ (১৯০৭-১৯৬৭) ছিলেন সম্পাদক।

এই পিতার সন্তান এএইচএম কামরুজ্জামানও দাদা এবং পিতার আদর্শকে সামনে রেখে বড় হন। বাবার জন্মের সময়ে তার দাদা হাজী লাল মোহাম্মদ সরদার ছিলেন কলকাতায়। তিনি রাজশাহী এসে পৌত্রের

আকিকার ব্যবস্থা করেন। পৌত্রের তিনি নামকরণ করলেন আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। ডাক নাম দিলেন তার দাদী 'হেনা'। হাসনা-হেনা ফুলের গন্ধ ও সৌরভে বংশের সুনাম বৃদ্ধি করবে এই হেনা আদরের পৌত্র; এই ছিল বড় আম্মার ঐকান্তিক প্রার্থনা। বড় আম্মার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। যে বংশে এএইচএম কামরুজ্জামান হেনার মতো বিশ্বনন্দিত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে সেই বংশের মর্যাদা ও সুনাম অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। বাবার বাল্যশিক্ষা শুরু হয় বাড়ীতে বাবার পিতৃব্য বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজসেবক কবি মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ সাহেবের কাছে। তারপর তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তাঁর এক ফুফা। হঠাৎ করেই তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে বদলি হয়ে যান। ফলে বাবাকেও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাসের পর রাজশাহী কলেজে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে ১৯৪৪ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাসের পর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৪৬ সালে অর্থনীতিতে অনার্সসহ ব্যাচেলর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল' পাস করেন। রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হিসেবে তিনি ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ সালে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এ কথা স্বীকার্য যে, চার পুরুষ রাজনীতিতে সক্রিয় এমন পরিবার বাংলাদেশে খুব বেশি নেই।

বাবা ১৯৫৬ সালে ল' পাসের পর রাজশাহী জজকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন এবং রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ বছরই তিনি রাজশাহী পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডে কমিশনার নির্বাচিত হন। একদিকে ওকালতি এবং অন্যদিকে রাজনীতি ও সমাজসেবা সমান তালে চলতে থাকে। তিনি ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এ সময় বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং ১৯৬২-এর আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি রাজশাহী থেকে ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে প্রথমবার এবং ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয়বার আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রথায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সম্মিলিত বিরোধী দলের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রাজশাহী বিভাগের বৃহত্তর ৫টি জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও উন্নতি সাধনের জন্য জরুরিভিত্তিতে যমুনা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। অধিবেশনের বাইরেও ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবি উত্থাপন ও প্রচারে বঙ্গবন্ধুর সহযোদ্ধা হিসেবে তিনি ইংরজি ও উর্দু ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

বাবা সমগ্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর পরে দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এ কারণেই তিনি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহবায়ক এবং ১৯৭০-৭১ পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাবা ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে রাজশাহী থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য পদ লাভ করেন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সরকার গঠনের ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খানের ষড়যন্ত্র ও পাকিস্তানী শাসক ও শোষক শ্রেণীর জঘন্যতম মনোবৃত্তির কারণে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা অর্পণ না করে রাতের অন্ধকারে নিরীহ ঘুমিয়ে থাকা বাঙালির উপর নরপশু সামরিক বাহিনীর সদস্যদের লেলিয়ে দেয়া হয় এবং তারা নির্বিচারে অগণিত নারী- পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে।

১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির ৩২নং বাড়ী থেকে তারই নির্দেশক্রমে বাবা শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদসহ কয়েকজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে বগুড়া হয়ে কলকাতায় চলে যান। সেখানে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

তারপর সুদীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধে নিরলসভাবে তিনি নেতৃত্ব দান করেন। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে তার অক্লান্ত শ্রম, শাণিত মেধা ও দক্ষ সাংগঠনিক শক্তির ফলে খুব অল্পসময়ের মধ্যে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত

করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের সুশৃঙ্খলভাবে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা, খাদ্য-রসদ, অস্ত্র-শস্ত্রসহ সব রকমের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেন এবং ভারতে প্রায় এক কোটি শরণার্থীর আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণে ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী হিসেবে তিনি কর্মদক্ষতা ও মেধার পরিচয় দিয়েছেন। রাত-দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে ভারতের সহায়তায় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সবরকম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে প্রতি মুহূর্তে তাদের উৎসাহিত করেছেন।

বাবা ৫/৬টি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন বলে বঙ্গবন্ধু বাবাকে বহির্বিশ্বে যোগাযোগ তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রাখতেন। দেশ স্বাধীনের পর মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীবর্গ ঢাকায় আসেন এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ১৯৭১ সালের ২৩ ডিসেম্বর নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। বাবা এই মন্ত্রিসভায় পুনরায় স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সরকার প্রধান হিসেবে তিনি পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করলে বাবাকে  ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এই সময়কালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ধ্বংসপ্রায় বাংলাদেশ পুনর্গঠনে তিনি নিরলস পরিশ্রম করেন। তার উপস্থিত বুদ্ধি, প্রখর মেধা ও মনন ছিল ঈর্ষণীয়। সর্বদা সহজ-সরল ও আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে তিনি তার চারিত্রিক ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার আচার-আচরণেও আলাদা একটা মাধুর্য পরিলক্ষিত হতো। মুখে পান, কণ্ঠে গুন গুন করে গান, সর্বদাই ঠোঁটে হাসি এবং অপরকে আপন করে নেয়ার মতো উদার ও মুক্ত মন ছিল তার। আমার বাবা সকলের প্রাণপ্রিয় নেতা। হেনা ভাইয়ের কাছে সকলেই নিঃসংকোচে তাদের ন্যায়সঙ্গত সব রকমের দাবি এবং কথা বলতে পারতেন। তার মনে সামান্যতম অহংকার ছিল না বা অসৎ প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব কখনোই তিনি পোষণ করতেন না। তিনি অন্যায়ভাবে কোনো তদবির মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি শুধু রাজশাহীর মন্ত্রী নই– সারা বাংলাদেশের মন্ত্রী। তার নিকট আত্মীয়-স্বজনরাও তার কাছে কোনো চাকরি বা তদবিরের  জন্য যাওয়ার সাহস করতেন না। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল বজ্রের মতো কঠিন। আবার শিশুর মতো সরল ছিল তার মন।

১৯৭৩ সালে আবারো মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হলে বঙ্গবন্ধু তাকে বাণিজ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব দেন এবং তিনি এই দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পালন করেন। এ বছরই রাজশাহীর দু'টি আসন থেকে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।  এই নির্বাচনের পর তিনি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারী তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এই বছরে ২০ জানুয়ারী আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৭৫ সালে মন্ত্রিসভা পুনঃগঠিত হলে তিনি শিল্প মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। একজন দায়িত্ববান পিতা হিসেবে তিনি সফল হলেও তাকে আমরা বেশি দিন পাইনি। আমি মনে করি, আমাদের মনের শোকাহত ভাব কিছুটা লাঘব হবে যদি দেখি আইনী ফাঁক-ফোকরে প্রকৃত অপরাধীরা বেরিয়ে যেতে না পারে। নিষ্ঠুরতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে যারা গুলি করার পর বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে হত্যা করেছে তাদের কোন  ক্ষমা নেই। ৪ শহীদ পরিবারের পক্ষ  থেকে আমি আজ জেল হত্যার সঠিক বিচারপ্রাপ্তির দাবি করছি, যার জন্য সমগ্র জাতি অপেক্ষার প্রহর গুনছে।

❑ লেখক : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

## ঢাবিতে ভর্তি বৈষম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যাহত

**এহসানুল হক জসীম**

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের রয়েছে একটি সংবিধান। রাষ্ট্রের এ সংবিধান তার নাগরিকদের প্রতি যে কোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের পক্ষপাতী নয়। সংবিধানের ২৮ (১) ধারায় বলা হয়েছে- 'কদণ্র্টণ ভর্ম ঢধ্রডরধবধভর্টণ টথটধর্ভ্র টভহ ডর্ধধড়ণভ মর থরমলভদ্র মভফহ মত রণফধথধমভ, রটডণ, ডর্ট্রণ,্রণস মর যফটডণ মত ঠধর্রদ.' অর্থাৎ "কেবল  ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।" উপরোক্ত ধারার এমন দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পরও ছলে-বলে-কলে-কৌশলে  বা  যে কোনভাবে রাষ্ট্র  কিংবা তার কোন প্রতিষ্ঠান কারো সাথে বৈষম্য প্রদর্শন

করার কথা নয়। তারপরও রাষ্ট্রের কোথাও কোথাও বৈষম্য হচ্ছে, লংঘিত হচ্ছে রাষ্ট্রের সংবিধান।

‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে রাষ্ট্রের নাগরিকদের বৃহৎ একটি অংশ। বৈষম্যের শিকার সে গোষ্ঠীটি হচ্ছে মাদ্‌রাসা থেকে পাস করে আসা ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। ২০০৯-১০ সেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় ছয়টি বিভাগে মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় মাদ্‌রাসা থেকে আসা শিক্ষার্থীরা যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারলেও, নিজেদের মেধার স্বাক্ষর রাখতে পারলেও, মাদ্‌রাসা ছাত্র হওয়ার অপরাধে এই ছয়টি বিভাগে তারা ভর্তি হতে পারবে না। বিভাগগুলো হচ্ছে– ইংরেজি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা।

মাদ্‌রাসা ছাত্ররা এসএসসি সমমান দাখিল এবং এইচএসসি সমমান আলিম শ্রেণীতে বাংলা ও ইংরেজি ২০০ নম্বর করে পড়ে না। এই অজুহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লিখিত বিভাগগুলোতে মাদ্‌রাসা ছাত্রদের ভর্তির ক্ষেত্রে এই অন্তরায়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গত বছরও এই অজুহাতে আরো দু’একটি বিভাগসহ এই কয়েকটি বিভাগে মাদ্‌রাসা ছাত্রদের ভর্তির পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এ নিয়ে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্ররা তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসা ছাত্রদের সাথে এমন আচরণ চরম বৈষম্যমূলক। যে কোন বিচারে এটি বৈষম্যমূলক একটি সিদ্ধান্ত হওয়ায় গত বছর এ নিয়মের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কয়েকজন ভর্তিচ্ছু ছাত্র হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করে। সে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ওই বছর ২৬ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একটি রুল জারি করেন। মামলার শুনানির একপর্যায়ে ২ ডিসেম্বর ওই বিভাগগুলোতে ভর্তির প্রক্রিয়া স্থগিত ঘোষণা করা হয়। অবশেষে মামলার শুনানি শেষ হলে ২০০৯ সালের ২০ জানুয়ারি বিচারপতি হাসমত আলী ও বিচারপতি হাসনাইনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ মাদ্‌রাসা ছাত্রদের পক্ষে রায় দেয়। এ রায়ের ফলে মাদ্‌রাসা ছাত্রদের ভর্তির ক্ষেত্রে আর কোন আইনগত বাধা থাকেনি।

মাদ্‌রাসা ছাত্রদের এই প্রতিষ্ঠিত ও আদালত কর্তৃক স্বীকৃত সাংবিধানিক অধিকারের প্রতি ঢাবি কর্তৃপক্ষের সম্মান জানানো উচিত ছিল। কিন্তু না, জাতীয় জীবনে মাদ্‌রাসা ছাত্রদের নিষ্ক্রিয় রাখার চক্রান্তে কর্তৃপক্ষ সংবিধান, জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩সহ সবকিছুকে উপেক্ষা করে আবারো চক্রান্তে মেতে উঠে। যে কোন মূল্যে তারা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে মাদ্‌রাসা ছাত্রদের আসার পথ বন্ধ রাখতে চায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন মহল থেকে জোরালো দাবি আসায় ১৯৭৩ সালে সরকার স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেয়। সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূরণের মধ্য দিয়ে ‘বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩’ জাতীয় সংসদে পাস হয়। একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের সাথে আলোচনা ও অনুমোদন ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এখতিয়ার রাখে। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক এবং নাগরিকের সাথে বৈষম্যমূলক কোন সিদ্ধান্ত এ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করার অধিকার রাখে না। এটি স্বায়ত্তশাসনের বৈশিষ্ট্য নয়। স্বায়ত্তশাসনের নামে বৈষম্য সৃষ্টির এখতিয়ার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়নি। সংবিধানের ২৮ (৩) ধারায় বলা হয়েছে– ‘ম ডর্ধধড়ণভ্র্দটফফ, মভ থরমলভদ্র মভফহ মত রণফধথধমভ, রটডণ, ডর্ট্রণ্রণস মর যফটডণ মত ঠধর্রদ ঠণ্রলঠনণর্ডধশণ ´ম টভহ ঢধ্রটঠধফর্ধহ, ফধটঠধফর্ধহ, রর্ণ্রধর্ডধমভ মর ডমভঢর্ধধমভ ষর্ধদ রণথটরঢ ´ম টডডণ্র ´ম টভহ ণঢলডর্টধমভটফ ধর্ভ্রর্ধর্লধমভ’, অর্থাৎ “কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।”

সংবিধানের এ ধারা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্ত সংবিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। এমনকি সংবিধানকে রীতিমতো বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন। এমন একটি বিতর্কিত ও বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সংবিধানের পাশাপাশি ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশও লংঘন করেছে। ওই অধ্যাদেশের

পার্ট-১ এর ৪৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভর্তির ক্ষেত্রে এ জাতীয় বিষয়ে নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে জেনারেল এ্যাডমিশন কমিটির সভায় সকল সদস্য ঐকমত্য পোষণ করবেন। বর্তমান এই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এমনটি পুরোপুরি মানা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য উৎস অনুযায়ী এ বছর জেনারেল এ্যাডমিশন কমিটির সভায় বিষয়টি আলোচনায় আসে। সেখানে কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সদরুল আমিনসহ কোন কোন সদস্যের অসম্মতি জ্ঞাপন সত্ত্বেও ভিসি ও প্রোভিসি এককভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এমন সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নিয়েছেন। অতএব, কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত সংবিধান এবং বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের যেমন পরিপন্থী তেমনি এ এক বড় ধরনের দুর্নীতি। ক্ষমতার অপব্যবহার দুর্নীতি বিধায় এটাকে দুর্নীতি বলা সম্ভবত ভুল হবে না।

জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুযায়ীও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসা ছাত্রদের সাথে এমন আচরণ চরম বৈষম্যমূলক। জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ২৬ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'উচ্চশিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।' মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীরা এ দেশের একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকার কথা বলা হলেও এখানে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং ঢাবি কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্ত জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদেরও চরম বিরোধিতার শামিল।

শিক্ষা মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম একটি। এটি অর্জনের সুযোগ এদেশের সকল নাগরিকের রয়েছে। সংবিধানের ২৭ ধারায় বলা হয়েছে- "সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।" রাষ্ট্র নাগরিকের এ অধিকারগুলো পূরণে বদ্ধপরিকর। শিক্ষা নাগরিকের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়লেও উচ্চশিক্ষা মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে কি-না সে প্রশ্নে যাব না। তবে উচ্চশিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যে সংবিধানের সুস্পষ্ট লংঘন সে কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। তারপরও আর একটু এগিয়ে গিয়ে উল্লেখ করতে চাই বিধানের ২৯ (১) নং ধারা অনুযায়ী 'প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।'

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল যখন একথা বলে তখন সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার অনার্স শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে অনৈতিক শর্ত জুড়ে দিয়েছে। এটা কি সংবিধানের পরিপন্থী নয়? এর ফলে বাংলাদেশের মাদ্‌রাসা থেকে দাখিল ও আলিম পাস করা হাজার হাজার শিক্ষার্থী নিজেদের যোগ্যতা নিরূপণের মাপকাঠি ভর্তি পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হলেও এই ছয়টি বিভাগে ভর্তি হতে পারবে না। এদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করে তাদের ভর্তির অধিকার নষ্ট করা শুধু যে সংবিধানের লংঘন তা নয়, বরং এটি একটি দেশকে দু'টি বিবদমান দলে বিভক্ত করার একটি অপপ্রয়াসও বটে। কেননা, একজন শিক্ষার্থী তার যোগ্যতার পরিচয় দেবে, এরপরও সে তার কাঙ্ক্ষিত বিভাগে ভর্তি হতে পারবে না– এটি বৈষম্য ছাড়া আর কি হতে পারে? এমনকি কোন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেও সে তার কাঙ্ক্ষিত বিভাগে ভর্তি হতে পারবে না। তার এই প্রথম স্থান অধিকার করা তখন একটি প্রহসন ছাড়া বৈকি।

যে কয়েকটি বিভাগে ভর্তির পথ রুদ্ধ করা হয়েছে তাতে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজি ২০০ নম্বর করে পাস করার। অথচ মাদ্‌রাসা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত সিলেবাসে বাংলা ও ইংরেজি ১০০ নম্বরের থাকলেও এর বিষয়বস্তু ও পরিধি ব্যাপক অর্থাৎ প্রায় ২০০ নম্বরের সমান। এ বিষয়গুলোর সাথে তাদের কোরআন, হাদীস, আরবী সাহিত্যসহ আরও অনেক বিষয় পড়ে আসতে হয়। এছাড়া একজন ছাত্র তো ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে তার যোগ্যতা প্রমাণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। মাদ্‌রাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের তো অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতা করেই ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। সুতরাং এই ২০০ নম্বরের শর্ত জুড়ে দেয়া একটি অজুহাত মাত্র। অন্যদিকে বলতে গেলে বলতে হয়, মাদরাসা শিক্ষার্থীরা তো আর ইচ্ছে করে ১০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি পড়ে না। এই ১০০ নম্বরের আইন নিজেদের তৈরি করা নয়। এটি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এবং অনুমোদিত। সরকারই তাদের বাংলা ও ইংরেজি ১০০ নম্বর করে পড়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এসব দিক বিচেনা করেই তো সরকার মাদ্‌রাসার দাখিলকে এসএসসির মান এবং আলিমকে এইচএসসির মান দিয়েছে, সেখানে তাদের স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে ঢাবি কর্তৃপক্ষের সমস্যা কোথায়?

বিভিন্ন দেশের বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদ্‌রাসা ছাত্ররা সুনামের সাথে অধ্যয়ন করছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী

দেশ ভারতের বিভিন্ন মাদ্রাসায় দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনকি মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা ডিগ্রি অর্জন করছে। সেখানে মাদ্রাসা, মহিলা কলেজ কিংবা কোন প্রদেশ থেকে সে এসেছে তা দেখা হয় না। বরং সবাইকে ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। পরীক্ষায় যোগ্যতা প্রমাণই আসল। এমনকি উচ্চশিক্ষার দেশ আমেরিকা, কানাডা কিংবা ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে এটা ধরা হয় না যে সে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি বা অন্যান্য বিষয়ে কতটা পড়াশোনা করেছে? এক্ষেত্রে যোগ্যতা হচ্ছে আসল এবং তাদের যোগ্যতা নিরূপণের মাপকাঠি হচ্ছে জিইডি বা স্কোরের ওপর। আমাদের দেশের বুয়েট, রুয়েট, ডুয়েট, চবি, রাবি, শাবিতে তো মাদ্রাসা ছাত্ররা ভর্তি হচ্ছে। তারা সেখানে অযোগ্য বিবেচিত না হলে ঢাবিতে কেন তারা অযোগ্য হবেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তো নিকট অতীতেও মাদ্রাসা ছাত্ররা সুনামের সাথে অধ্যয়ন করছে বর্ণিত বিষয়গুলোতে।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এক এক করে ১২টি বছর পেরিয়ে আর সব ছাত্রের মতো মাদ্রাসার ছাত্ররাও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় পা রাখে। সে উচ্চশিক্ষার সোপানে আরোহণের স্বপ্ন দেখে। এ মুহূর্তে ভর্তির ক্ষেত্রে অযৌক্তিক শর্ত জুড়ে দিয়ে তাদের ভর্তির পথ রুদ্ধ করে দেয়া শুধু বেঠিকই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের সাথে গাদ্দারীও বটে। কেননা, জাতিকে মুক্তির নেশায় উজ্জীবিত করতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা। বলতে দ্বিধা নেই এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের জন্য। যদিও প্রতিষ্ঠার পর এখানে অমুসলিমদেরও লেখাপড়া করার সুযোগ ছিল। শোষিত-বঞ্চিত আর পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের উন্নতির লক্ষ্যে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববাংলা ও আসামকে নিয়ে ১৯০৫ সালে যাত্রা শুরু হয় বঙ্গভঙ্গের। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের উন্নতি সাধিত হচ্ছিল। বর্ণবাদী হিন্দুদের কাছে এ উন্নতি ভাল লাগেনি। তাদের চরম বিরোধিতার একপর্যায়ে ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে। এতে বিক্ষুব্ধ হয় পূর্ববাংলার মুসলমানরা। আশাভঙ্গের কবলে পড়ে তারা। মুসলমানরা যে তিমিরে ছিল আবারো সে তিমিরে নিক্ষিপ্ত হলো। তাদের অপূরণীয় ক্ষতিসাধিত হলো। পূর্ববাংলার বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের বিক্ষোভ নিরসন এবং মুসলমানদের ক্ষতি পূরণের নিমিত্তে লর্ড কার্জন ১৯১২ সালে ঢাকায় এসে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। আর সে তো হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যা পরবর্তীতে প্রাচ্যের অক্সফোর্ডের মর্যাদা লাভ করে। মুসলমানদের ক্ষতি পূরণের নিমিত্তে যে বিশ্ববিদ্যালয়, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিভাগে মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি অংশ মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির পথ রুদ্ধ। এ কেমন কথা?

❑ লেখক : শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# ঘড়ির কাঁটা পরিবর্তনের লাভ-ক্ষতি

**বায়েজীদ হোসাইন সালেহ**

সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ তারিখ দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠার আট নম্বর কলামে উল্লেখ করা হয় আগামী ১ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশে ঘড়ির কাঁটা ১ ঘণ্টা পিছিয়ে ফের সাবেক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গত ১৮ জুন দিবাগত রাত ১১টায় ডে-লাইট সেভিং কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশে ঘড়ির কাঁটা ১ ঘণ্টা এগিয়ে ১২টা করা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯ জুন থেকে এ কর্মসূচী চালু হয়। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ কর্মসূচী চালু রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কারণ ১ অক্টোবর থেকে শীত মৌসুম শুরু হওয়ায় শুধু গ্রীষ্ম মৌসুমের জন্যই পরীক্ষামূলক এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছিল। ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত ১টায় ঘড়ির কাঁটা ১ঘণ্টা পিছিয়ে এনে ১২টা করা হবে এবং ১ অক্টোবর থেকে পরবর্তী বছরের অর্থাৎ ২০১০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এ সময়সূচী বহাল থাকবে।

এই রিপোর্ট প্রকাশের ১ সপ্তাহ যেতে না যেতেই গত ৪ অক্টোবর (রোববার) দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠার ৫ নম্বর কলামে 'সময়সূচী বদলানোর পরিকল্পনা সরকারের নেই' শিরোনামে রিপোর্ট ছাপা হয়। এতে বলা হয় বর্তমান সময়সূচীতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এনামুল হক। তিনি গত ৩ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ইয়ুথ ইকোফোরাম' আয়োজিত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে জাপানের এলইডি প্রযুক্তির ওপর এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন।

উল্লেখ্য যে, চলতি বছরের জুন মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে বিদ্যুৎ সঙ্কট মোকাবেলায় সূর্যালোকের ব্যবহার বাড়াতে ঘড়ির কাঁটা ১ ঘণ্টা এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং তা ১৯ জুন থেকে কার্যকর করা হয়। ১ অক্টোবর তা ১ ঘণ্টা পেছানোর কথা থাকলেও তা কার্যকর করার কোন ইচ্ছা সরকারের আছে বলে মনে হচ্ছে না।

বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও সরকারের অন্য মন্ত্রীরাও উচ্চ কণ্ঠে বলে বেড়াচ্ছেন যে, ঘড়ির কাঁটা ১ ঘণ্টা আগানোর কারণে নাকি খুব বিদ্যুৎ সাশ্রয় হচ্ছে। আসলে কি তাই? এ ব্যাপারে দু'টি পক্ষের মতামত ও যুক্তি-তর্ক আমরা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি।

এর মধ্যে একপক্ষ সরকার। অপরপক্ষ দেশপ্রেমিক জনগণ ও বিশেষজ্ঞ মহল।

সরকার পক্ষ অর্থাৎ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার' অনেক কর্মসূচীর মধ্যে ঘড়ির কাঁটা ১ ঘণ্টা এগিয়ে আনার বিষয়টি বেশ জোরেশোরে মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচার করা হয়। এর জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ বহু পরিমাণে অপচয় করা হয়। রাস্তাঘাট, দোকান-পাট, শহর-বন্দর, অফিস-আদালতসহ প্রতিটি সেক্টরে বিষয়টি নিয়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সরকারের পক্ষ থেকে তখন খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে দেশবাসীকে জানানো হয়েছিল এতে করে প্রায় ৩শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দিলে, স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালতের সময়সূচীতেও কোন পরিবর্তন হবে না এমন কথাও তুলে ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. তৌফিকই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম।

অপরদিকে দেশের আপামর জনসাধারণ ও বিশেষজ্ঞ মহলের মতামত ছিল ঘড়ির কাঁটা ১ ঘণ্টা এগিয়ে সার্বিকভাবে তেমন কোন লাভ হবে না। বাস্তবে হয়েছেও তাই। বিদ্যুৎ সাশ্রয়তো হয়নি বরং ভয়াবহ লোশেডিংয়ের কারণে দেশবাসী বিশেষত রাজধানীবাসী অতিষ্ঠ এবং এখনও তাই হচ্ছে। তবে সরকারের অতি উৎসাহী একটি অংশ যারা ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নেয়ার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তারা যদি বিদ্যুৎ বিভাগের দীর্ঘদিনের নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা রোধকল্পে সামান্য হলেও পদক্ষেপ নিতেন, তাহলে সেটিই হতো যথার্থ কাজ। এতে করে দেশবাসীর সমর্থনও সরকার সহজেই লাভ করতে পারতো। কিন্তু মহাজোট সরকার জনগণের মতামতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজের মতটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এখন জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ইতোমধ্যে দিন প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা ছোট হয়ে গেছে। গত মাসের শুরু থেকেই ঘড়ির কাঁটা পূর্বের সময়সূচী অনুযায়ী এক ঘণ্টা পেছানোর নির্ধারণ করার কথা ছিল। কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এ ব্যাপারে ওই কলাম লেখার সময় পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোন ঘোষণা দেয়া হয়নি। সরকারের মন্ত্রীরা এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় থেকে একেক সময় একেক কথা বলা হয়। এ নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তিও দেখা দিয়েছে।

দিন ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে এখন 'ডিজিটাল টাইমে সকালেই ৭টা বেজে যাচ্ছে। দিন আর কতটুকু ছোট হওয়ার পর সরকার ঘোষণা দেবে কিংবা আদৌ কোন ঘোষণা দেবে কিনা তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর কেউ আগাম কিছু বলতেও পারছে না। অপর দিকে দিন ছোট হওয়ার কারণে 'ডিজিটাল টাইমে' কাজ করতে ও দারুণ সমস্যা হচ্ছে।

গত ১ জুন মন্ত্রিসভার বৈঠকে জানানো হয় আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। সন্ধ্যায় দেশে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট। চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি থাকায় প্রতিদিন পিক আওয়ারে গড়ে ৮০০ থেকে এক হাজার মেগাওয়াট লোডশেডিং করতে হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে 'ডিজিটাল টাইমে' প্রতিদিন ২০০ থেকে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। এছাড়া কর্মঘণ্টা আগে শুরু হওয়ায় রাজধানীতে যানজট পরিস্থিতিরও উন্নতি হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু এ দাবীর যথার্থতা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন রয়েছে। কেননা এখনও এলাকা বিশেষে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুতের লোডশেডিং হচ্ছে।

ঢাকা শহরের ৪২টি থানার প্রায় প্রতিটি থানাতেই প্রত্যহ ৭ থেকে ৮বার লোডশেডিং হচ্ছে। কোন কোন এলাকায় তার চেয়ে বেশি হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে কোন কোন এলাকায় একবার বিদ্যুৎ গেলে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা পর আসে। এর ফলে অসহনীয় গরমের কারণে বৃদ্ধ নারী-পুরুষ ও ছোট ছোট বাচ্চারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। হাসপাতালগুলো রোগীদের চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে।

এর পাশাপাশি যানজট যন্ত্রণায় নাগরিক জীবন থমকে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বহু পূর্বেই।

খোদ সরকারের প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ে ডিজিটাল টাইম নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এ ধরনের কর্মসূচী না দিয়ে সরকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে ভিন্ন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারতো। তারা বলেন, গড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে না এনে অফিস সময় সকাল ৯টার পরিবর্তে ৮টা এবং ছুটি বিকেল ৫টার পরিবর্তে ৪টা করা যেত। দোকান, মার্কেট রাত ৮টার পরিবর্তে ৭টায় বন্ধ করা হলে আর ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে আনার প্রয়োজন ছিল না।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের আশ্বাস দিয়ে এবং লোডশেডিং অনেকটা কমে আসবে। সরকারী অর্থে মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এমন প্রচারণা চালিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফেলে যাওয়া যে কর্মসূচীটি জাতির কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তার কোন সুফল জাতি এখনও দেখতে পায়নি। এ পরিস্থিতি শীত মৌসুমে জনভোগান্তিকে বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দেবে।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে কার্যত জনগণ কোন সুবিধা পেয়েছে কিনা? এ ব্যাপারে পিডিবি'র এক কর্মকর্তা রসিকতার সুরে বলেছেন, ঘড়ির কাঁটায় তো আর বিদ্যুৎ থাকে না যে কাঁটা এগিয়ে দিলেই বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।

এফবিসিসিআই-এর সদস্য এক ব্যবসায়ী নেতা জানান, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবসায়ীদের চাপের মুখে এ জনবিভ্রান্তিকর কর্মসূচীটি বাস্তবায়ন করার সাহস দেখায়নি। অথচ নির্বাচিত সরকারকে নিয়ে আমলারা এর বাস্তবায়ন করিয়েছেন। আর এখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গেছে যে, সরকার এ থেকে আর পিছিয়ে আসতে পারছে না। ফলে বিভিন্ন অফিস-আদালত ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সময়সূচী নিয়ে শীতের সকালে বেশ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয় অভিভাবক, স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও অফিসগামীদের।

অবস্থা যখন এই ঠিক তখনই বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর অপর একটি মন্তব্যে দেশবাসী যারপরই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

ঘড়ির কাঁটা ১ ঘণ্টা এগিয়ে আনার কারণে বিগত সাড়ে চার মাসে যেখানে জনগণ কোন সুফলই ভোগ করতে পারে নাই, সরকার লোডশেডিং বন্ধ করতে পারে নাই, জনগণকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে সেখানে আবার সরকার অফিস, আদালত, ব্যাংক-বীমা, স্কুল ও কলেজের আলাদা সময়সূচী ঘোষণা এবং ইতোমধ্যে তা কার্যকর করার মাধ্যমে জনগণের কষ্টের ষোলকলা পূর্ণ করতে শুরু করেছে। যানজট নিরসনে ডিজিটাল সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তার কোনটাই কাজে আসছে না।

সর্বশেষ পদক্ষেপ হচ্ছে, গত ১২ অক্টোবর সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা ঢাকা মহানগরীর সকল সরকারী, বেসরকারী অফিস, বিধিবদ্ধ সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকালীন নতুন সময়সূচী নির্ধারণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এবং ১৮ অক্টোবর থেকে তা ইতোমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে। যানজট কমানোর জন্য গৃহীত এই নতুন সময়সূচীতে খুব একটা লাভ হবে না বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এক্ষেত্রে সরকারের কাছে পরামর্শ হলো (ক) বিদ্যুৎ বিভাগকে দলীয় ও আত্মীয়করণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে, (খ) দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। (গ) কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিতে হবে।

অপরদিকে যানজট নিরসনে সময়সূচীর পরিবর্তন নয় বরং রাস্তাঘাটের উন্নয়ন একান্ত জরুরী। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা শহরের পোস্তগোলার বুড়িগঙ্গা সেতু থেকে ধোলাইপাড় পর্যন্ত সর্বোচ্চ এক কিলোমিটার রাস্তা হবে। দক্ষিণবঙ্গের সাথে ঢাকার যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম এই সেতু। এই এক কিলো রাস্তা পার হতে বড় জোর ৫ মিনিট সময় লাগার কথা। অথচ রাস্তা এতোই খারাপ যে সামান্য এইটুকু পথ অতিক্রম করতে কোন কোন সময় ৩০ থেকে ৪০ মিনিট পর্যন্ত সময় লাগে। রাস্তাটি দেখে মনে হয় না আমরা রাজধানীতে বসবাস করছি। ঢাকা শহরে প্রবেশের আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ সড়ক হচ্ছে কাঁচপুর-চিটাগাং রোড সড়ক। ওই সড়কের মাতুয়াইল মেডিকেল অতিক্রম করে একটু সামনে গেলেই সানারপাড় থেকে শুরু হয় ভাঙ্গা রাস্তা। জনগুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যার দিকে নজর না দিয়ে যানজট নিরসনের নামে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে এবং সময়সূচীর পরিবর্তনের মাধ্যমে জনজীবন বিপর্যস্ত করে ফেলা হয়েছে।